Tab 1

সময় চলে যাচ্ছে

শাকিল আহমেদ সাগর

সময় চলে যাচ্ছে

শাকিল আহমেদ সাগর

এই বইটি আমি উৎসর্গ করছি—
আমার মা-বাবাকে, যাঁদের ভালোবাসা ছাড়া কোনো শব্দই গভীরতা পায় না।
আমার শিক্ষকদের, যাঁরা আমাকে চিন্তা করতে শিখিয়েছেন।
আমার বন্ধুদের, যারা নিঃশব্দে সাহস দিয়েছে।
এবং
তাদের জন্য, যারা জীবনের প্রতিটি ক্ষণ মূল্যবান করে তোলার শিক্ষা দিয়েছে।

— শাকিল আহমেদ সাগর

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২৫ | কিশোরগঞ্জ
সাগর ডিজিটাল আইটি
https://books.sagordigitalitbd.top

মূল্য : ৮০.০০ টাকা

সূচিপত্র

অধ্যায়	নাম	পৃষ্ঠা
১	প্রথমে সময় থেমে গিয়েছিল	**4**
২	কাজে লাগানোর মানুষ	**6**
৩	এক কাপ চা	**8**
৪	স্মৃতির পেন্সিল	**11**
৫	ভাঙা দেয়ালের পেছনে	**14**
৬	বাতিঘরের গল্প	**15**
৭	অপেক্ষার ঘর	**16**
৮	হারানো স্বপ্নের খোঁজে	**17**
৯	ভাঙা আয়নায় নিজের ছবি	**18**
১০	নিঃসঙ্গতার সুর	**19**
১১	নতুন সূর্যের অপেক্ষায়	**20**
১২	স্মৃতির পাখির গান	**21**
১৩	ধৈর্যের আলো	**22**
১৪	নতুন সকাল	**23**
১৫	ছোট খুশির খোঁজে	**24**
১৬	আত্মবিশ্বাসের গান	**25**
১৭	বন্ধুত্বের ছায়ায়	**26**
১৮	আশার দিশারি	**27**
১৯	জীবনের বাঁকে বাঁকে	**28**
২০	সময় চলে যাচ্ছে — সমাপ্তি	**29**

অধ্যায় ১: প্রথমে সময় থেমে গিয়েছিল

ঘড়ির কাঁটা তখন থেমে ছিল দুপুর ১টা ১২ মিনিটে। ঠিক তখনই, তানভীরের বাবা মারা যান।
ঘড়ি বন্ধ হয়নি, বাতাসও থেমে যায়নি, চায়ের কেটলিতে ফুটন্ত জল তখনও বুদ বুদ করছিল। তবুও সেই মুহূর্তে তানভীরের কাছে সবকিছু থেমে গিয়েছিল। সময়ের চলার শব্দ যেন মাটির নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল।
তিনি মৃত। তানভীর ভেবেছিল এই তিন শব্দ পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তুলবে। কিন্তু না। বাইরে কাক ডেকে গেল, পাড়ার বাচ্চারা ক্রিকেট খেলছিল, একটা ট্রাক হর্ন বাজিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল— জীবন চলছিল।
শুধু তানভীর থেমে গিয়েছিল। তার বুকের ভেতরে একটা অদৃশ্য ভাঙন হচ্ছিল। যা কারো চোখে পড়ছিল না, শুধু সে অনুভব করছিল প্রতিটি ধসে পড়া স্তর।

তার বাবাকে নিয়ে তানভীর কখনো বেশি কিছু ভাবেনি।
তারা একসাথে বসে গল্প করত না, একসাথে সিনেমা দেখা হতো না, তানভীর বাবার সঙ্গে তেমন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়তে পারেনি। কারণ? সময় ছিল না।
স্কুল, কলেজ, চাকরি, ক্যারিয়ার, টেনশন, ব্যস্ততা— তানভীর সবকিছুতে সময় দিয়েছে, শুধু সেই মানুষটিকে নয়, যিনি একদিন তার ঘুমন্ত চোখে হাত বুলিয়ে বলেছিলেন, “আমি পাশে আছি, ভয় পাবি না।”
বাবা কখনো তার কাছে অভিযোগ করেননি। তানভীরও কখনো বাবার কাঁধে মাথা রেখে বলেনি, “তুমি কি ঠিক আছো?”
আজ মনে হচ্ছিল, সব না বলা কথা ছাদ ভেঙে মেঘ হয়ে জমছে মাথার ওপর।

তানভীরের ভেতর অদ্ভুত শূন্যতা।
সবাই কাঁদছে। মা প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলছেন, বোন বারবার ডাকছেন, “ভাইয়া, এখন কী করবো?” কিন্তু তানভীর চুপ। নিশ্চল। নিস্তব্ধ। তার চোখে জল নেই। শুধু বুকের ভেতর জ্বলে যাচ্ছে নিঃশব্দ একটা আগুন।
সে তাকিয়ে ছিল বাবার মুখের দিকে। শেষবারের মতো। চোখ দুটো অর্ধেক বন্ধ, ঠোঁটে সামান্য কাঁপন। কি যেন বলতে চেয়েছিলেন হয়তো।
"তুই ভালো থাকিস তানভীর…" না বলা বাক্যটা জমে ছিল ঠোঁটের কিনারায়।

সময়টা তখনও চলছিল, কিন্তু তানভীর আটকে ছিল।
সেই সকালে সে অফিসের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। বাবার শরীরটা একটু খারাপ ছিল, তবুও সে মাকে বলেছিল, "আমি ফিরেই ডাক্তার দেখাবো, তুমি চিন্তা করো না।"
ফিরেই আর ডাক্তার দেখানো হয়নি। ফেরাটা খুব দেরিতে হয়েছিল। যখন বাবার শরীর ঠান্ডা, আর মুখে কেবল নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধতা।

একটা মনের ভেতরে সারা জীবনের দায় জন্ম নেয় এমন দিনে।
তানভীর জানে, সে বাবাকে সময় দেয়নি। একটা ফোনকল, একবার পাশে বসা, এক কাপ চা— সবই হয়ে উঠেছিল অসম্পূর্ণ। কত কথোপকথন ছিল, যা কখনো হয়নি। কত উত্তর ছিল, যেগুলো আজ কেউ জানবে না। বাবা কি তাকে নিয়ে গর্বিত ছিলেন? বাবা কি তাকে ভালোবাসতেন? বাবা কি কখনো কেঁদেছিলেন তার জন্য?
এ প্রশ্নগুলোর উত্তর সময় নিয়ে গেছে। এবং সময় কোনোদিন ফিরে আসবে না।

**মানুষ কখনো কখনো অনুভব করে, সে ভালোবাসা পেয়েছিল।
কিন্তু তা অনুভব করে যখন, তখন ভালোবাসার মানুষটি থাকে না।**
তানভীর কফিনের কাঠে হাত রাখে। আঙ্গুলে হালকা কাঁপুনি। সে জানে বাবা শোনেন না। তবুও ফিসফিস করে বলে, “আমি আপনাকে মিস করবো আব্বু।”
শব্দটা খুব ছোট, কিন্তু তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বীকারোক্তি হয়ে যায় সেটি।

সময় চলে যায়। কিন্তু কিছু সময় থেকে যায় হৃদয়ের গভীর গোপন গহ্বরে।
সেদিন থেকে তানভীরের ঘুম আসে না ঠিকমতো। সে প্রতিদিন রাত্রে উঠে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে। চাঁদ দেখে, অন্ধকার দেখে, নিঃসঙ্গতা দেখে। কখনো বাবাকে স্বপ্নে দেখে।
স্বপ্নে বাবা কিছু বলেন না। শুধু তাকিয়ে থাকেন, একটি স্মিত হাসি নিয়ে, একটি না বলা কথার অপেক্ষায়।
তানভীর জেগে উঠে চোখ মুছে ফেলে। আয়নায় নিজের মুখ দেখে, এবং নিজেকেই প্রশ্ন করে— "আমিও কি কেবল সময়ের ভিতর হারিয়ে যাচ্ছি?"

সেদিন থেকে তানভীর আর সময়ের উপর ভরসা করে না। কারণ সে জানে, সময় চলে যায়, কিন্তু মানুষ পড়ে থাকে—একটা শেষ না হওয়া কথার পাশে, একটা নিঃশ্বাসহীন মুহূর্তের ভেতর।

অধ্যায় ২: কাজে লাগানোর মানুষ

তানভীর একদিন আয়নায় নিজের মুখে তাকিয়ে ভেবেছিল,
"আমার কি আসলে কেউ দরকারি মনে করে? নাকি শুধু কাজে লাগায়?"

ছোটবেলা থেকে শুরু হয়েছিল এই অনুভব।
যখন কারো সাহায্য দরকার হতো, তানভীরকে ডাকা হতো।
বন্ধুরা হোমওয়ার্কের সময় খোঁজ করত,
আত্মীয়রা ডাকত মোবাইলে চার্জ নেই বলে।
সবার প্রয়োজন ফুরালেই—
তানভীর যেন হাওয়ার মতো উবে যেত।

তাকে কেউ একটা চায়ের কাপের জন্য ডাকেনি।
কেউ বলেনি,
"তুই কেমন আছিস?"
—

একদিন এক বান্ধবী বলেছিল, “তুই না এমন, যাকে পাশে রাখলে সুবিধা হয়।”

সেদিন তানভীর হেসে ফেলেছিল।
কিন্তু সেই হাসির নিচে লুকিয়ে ছিল একরাশ বিষাদ।

ভালোবাসা নয়,
প্রয়োজন ছিল সে।
কেউ একটা সিঁড়ি চাইলেই তানভীর হয়ে যেত কাঠের মই।
উপরে উঠে যেত তারা।
তানভীর পড়ে থাকত নিচে—ধুলো মাখা, চুপচাপ।

**বাবার মৃত্যুর পরে সে টের পেল,

সে নিজেও কতজনকে শুধু কাজে লাগিয়েছে—
ভালোবাসা নয়, প্রয়োজনেই।**

তার মা তাকে প্রতিদিন অপেক্ষায় রাখত একটা গল্প শোনার আশায়।
সে কখনো সময় পায়নি।
তার ছোটবোন একবার রাতে কেঁদেছিল—ভয় পেয়েছিল।
তানভীর তখন ছিল ফোনে, ক্লায়েন্টের মিটিংয়ে।

সে জানত, প্রয়োজন ফুরালে মানুষ ভুলে যায়।
কিন্তু সে নিজেও তো ভুলে গিয়েছিল প্রয়োজনের বাইরে মানুষকে ভালোবাসতে।

তানভীর একটা সিদ্ধান্ত নেয় সেদিন—

এবার সে কাউকে প্রয়োজনের জন্য নয়,
ভালোবাসার জন্য পাশে রাখবে।
এবার সে শুধু অন্যের কাজ হাসিল করবে না,

নিজেকেও ভালোবাসতে শিখবে।

কিন্তু সময় তো চলে যাচ্ছে…
তাকে থামতে দিচ্ছে না।
একটা ক্লায়েন্ট ফোন, একটা মিটিং, একটা ডেডলাইন।
সবশেষে আবার নিঃসঙ্গ ঘর, এক কাপ ঠান্ডা চা আর অব্যক্ত দীর্ঘশ্বাস।

এক রাতে সে নিজেই নিজের ফোনে টেক্সট লিখে রাখে—

> “আজকে কাউকে শুধু তার প্রয়োজনের জন্য ভালোবেসো না।
একবার শুধুই তার জন্য ভালোবেসো।”

কেউ সেটা পড়বে না।
তবুও সে লেখে।
কারণ তানভীর জানে,
সময়ের ঢেউয়ে মানুষ গা ভাসিয়ে দেয়।
কিন্তু কেউ কেউ থাকে যারা সাঁতারে ক্লান্ত,
তারা শুধু চায়—
একটা হাত,
একটু ভালোবাসা,
একবার জিজ্ঞেস করে কেউ:
‘তুই ঠিক আছিস?’

এই অধ্যায় শেষ হয় এক নিরব বার্তার মতো—

তানভীর আয়নায় নিজের চোখে চোখ রাখে,
এবং ধীরে বলে ওঠে,
“আমি এখন বুঝি—কাজে লাগানোর মানুষ আর ভালোবাসার মানুষ এক নয়।
আমি এখন ভালোবাসতে চাই,
সময়ের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত…”

অধ্যায় ৩: এক কাপ চা

চা—এত সাধারণ শব্দ, অথচ এই তিন অক্ষরের ভেতরেই তানভীরের কত স্মৃতি।
চায়ের কাপ ছিল কখনো আলাপের সেতু,
আবার কখনো ছিল বিচ্ছেদের নীরব সাক্ষী।

এখন রাতে একা বসে চা খায় সে।
একটা কাপ, একটা চেয়ার, আর এক ঝলক হালকা ধোঁয়া—
যা বাতাসে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মনে করিয়ে দেয়,
"তোর জীবন থেকেও মানুষগুলো ঠিক এভাবেই মিলিয়ে গেছে।"

এক সময় চায়ের ঘ্রাণ মানেই ছিল মা।

মা প্রতিদিন ভোরে উঠেই প্রথম কাজ করতেন চা বানানো।
ঘরজুড়ে এক ধরনের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত—
আদা, লবঙ্গ আর মায়ের ভালোবাসার মিশ্রিত গন্ধ।

মা চুপচাপ কাপটা বাড়িয়ে দিতেন।
কোনো কথা বলতেন না,
তবু তানভীর বুঝে যেত—আজকের সকালটা শান্ত, মমতাভরা।

একদিন মা বলেছিলেন,
"তুই যখন চা খাস, তোর মুখে একটা শান্তি আসে,
যেটা তোর বাকিদের সঙ্গে থাকা সময়েও দেখি না।"

তানভীর সেই কথায় হেসেছিল,
কিন্তু হেসে নিজেই নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছিল।

তারপর এলো বিশ্ববিদ্যালয়। সুবর্ণা।

সুবর্ণা ছিল অন্যরকম।
সে চা খেত ধীরে, চোখ বুজে, যেন প্রতিটা চুমুক একটা অনুভব।
তানভীরকে বলত,
"চা তাড়াহুড়ায় খেলে স্বাদ পাওয়া যায় না। যেমন সম্পর্কও তাড়াহুড়ায় নষ্ট হয়ে যায়।"

তারা প্রতিদিন ক্লাস শেষে যেত একটা পুরনো চায়ের দোকানে।
একটা বাঁধানো বেঞ্চে বসে, একটা চায়ের কাপ ভাগ করে নিত।
কখনো কখনো চা ঠান্ডা হয়ে যেত, কিন্তু কথার তাপ শেষ হতো না।

সুবর্ণা প্রথম বুঝিয়েছিল,
চা মানে এক ধরনের আশ্রয়,
যেখানে ক্লান্তি এসে মাথা রাখে।

কিন্তু তানভীর বুঝে উঠতে পারেনি, সময়ের চেয়ে সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ।

ধীরে ধীরে ক্লাস, চাকরি, মিটিং, ফাইল, ডেডলাইন—
সবকিছুর ভিড়ে হারিয়ে গেল সুবর্ণা।

চায়ের কাপ যেমন রেখে দিলে ঠান্ডা হয়ে যায়,
তেমনি একদিন সম্পর্কটাও হয়ে গেল নিস্তেজ।

সুবর্ণা বলেছিল,
“তুই শুধু আগাতে চাস, আমি শুধু চাই একটু বসিস।
তুই হয়তো সফল হবি,
কিন্তু আমি তোর গল্পে শুধু একটা ছোট্ট নোট হয়ে থাকব—‘এক কাপ চা খেয়েছিলাম একদিন।’”

তানভীর এখনো সেই কথা মনে রাখে।

আজ সে চা খায় একা।
মায়ের হাত কাঁপে,
সুবর্ণা অন্য শহরে, কারো স্ত্রী হয়ে গেছে।

চায়ের কাপগুলো এখন শুধু টেবিলে পড়ে থাকে,
ধোঁয়া নেই, গন্ধ নেই, সঙ্গ নেই।

সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ভাবে—
“একদিন তো ছিল, যখন এই কাপেই ছিল ভালোবাসা।
এখন এটা শুধু অভ্যাস।”

একদিন মা খুব ধীরে এসে পাশে বসেন।

চোখে জল, হাতে কাপ।
বললেন,
“তুই আমায় অনেক কিছু দিস,
কিন্তু এই চায়ের সময়টা আগে যেরকম ছিল,
সেটা আর পাই না।”

তানভীর স্তব্ধ হয়ে যায়।
তার মন কেঁপে ওঠে।
সে মায়ের পাশে বসে, চায়ের কাপ এগিয়ে দেয়।

আজ অনেকদিন পর, দু’জনের কাপ একসাথে বাজে।
চায়ের কাপ টুং করে উঠলে সে ভাবে—
"এই শব্দটাই হয়তো জীবনের সবচেয়ে মিষ্টি স্মৃতি।"

রাতে তানভীর নিজের ডায়েরিতে লেখে—

> “এক কাপ চা মানে ভালোবাসা, মানে সময়, মানে অপেক্ষা।
যার সঙ্গে তুই চা খাস, তার সঙ্গে জীবনের স্বাদ বদলায়।
মানুষ না থাকলে চা শুধু গন্ধহীন পানীয়।
মানুষ থাকলে সেটা হয়ে ওঠে মুহূর্ত।”

সেদিন রাতে চা খেয়ে তানভীর চুপচাপ আকাশ দেখে।

তার কপালে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগে।
সে শুধু ভাবে,
“আজ যদি কেউ হঠাৎ এসে বলত,
তুই চা খেয়েছিস?”

তখন সে হয়তো উত্তর দিত না,
শুধু তাকিয়ে থাকত...
কারণ কোনো কোনো উত্তর ভাষা দিয়ে হয় না—
তাদের জন্য এক কাপ চা-ই যথেষ্ট।

অধ্যায় ৪: স্মৃতির পেন্সিল

বিকেলের আলোটা জানালার ফাঁক দিয়ে ঘরে ঢুকছে।
এক ধরনের ধুলোমাখা সোনালি আলো—
যেটা কেবলমাত্র নীরব ঘরে, একা মানুষের বুকের উপর এসে পড়ে।
তানভীর আলনাটা খুলে পুরোনো খাতাগুলো বের করছিল,
যার একেকটা পাতায় সময় আটকে আছে।

সে ধীরে ধীরে বের করল একটা কালো কভারের স্কেচবুক।
বইটার উপরের অংশ কিছুটা ছেঁড়া, নিচের কোণায় দাগ, আর পাতাগুলো সময়ের ধুলায় নরম হয়ে গেছে।
এই বইটাতে তানভীর একসময় পেন্সিলে অগুনতি ছবি এঁকেছিল।
কিন্তু এখন… সে নিজেই চিনতে পারে না, এই রেখাগুলো তার নিজের কি না।

—

প্রথম পাতাটা খুলতেই দেখতে পেল একটি মুখ।

একটা মেয়ের মুখ—চুল উড়ছে, চোখ দূরে তাকিয়ে, ঠোঁটে হালকা হাসি।
নাম লেখা নেই।
তবে চোখদুটো দেখে বোঝা যায়, এই চেহারায় ছিল এক সময়ের আকাঙ্ক্ষা,
এক সময়ের স্বপ্ন,
আর এক সময়ের তীব্র ভালোবাসা।

তানভীরের মনে পড়ে যায় নামটা—
"নিলা"।

—

নিলা ছিল সময়ের বাইরে একটা মানুষ।

সে ছবি আঁকত, হাঁটত বৃষ্টির মধ্যে,
আর প্রতিটি মুহূর্তকে মনে করত একটা ছোট্ট সিনেমার দৃশ্য।

একদিন তানভীরকে বলেছিল,
“তুই কখনো সময়কে আঁকতে পারিস?”

তানভীর হেসে বলেছিল,
“সময় আবার আঁকার মতো জিনিস?”
নিলা হেসে বলেছিল,
“আছে। কেউ কারো জন্য অপেক্ষা করে যখন,
তখন সেই মুহূর্তটাই সময়।
আর সেই অপেক্ষার ছবি আঁকতে পারলে,
তুই সময়কে ছুঁয়ে ফেলবি।”

—

তানভীর আঁকত, কিন্তু অপেক্ষা করতে পারত না।

সে সময়ের চেয়ে বড় হতে চেয়েছিল।
চাকরি, আয়, নাম, ব্যস্ততা—সবকিছুর ভিড়ে নিলাকে সময় দেওয়া হয়নি।
আর একদিন, নিলা চলে গিয়েছিল।
চুপচাপ।
একটা নীল রঙা চিঠি রেখে,
যেখানে শেষ লাইনে লেখা ছিল—

> "তুই সময়কে আঁকতে পারলি না,
কিন্তু সময় তোর ছবি রেখে গেল—তুই শুধু খেয়াল করিস।"

—

স্মৃতির পেন্সিল আসলে মুছে না, ঘোলা করে দেয়।

তানভীর খাতার একটা পাতায় আঙুল বুলায়।
একটা গাছের ছবি, যেখানে পাতাগুলো নেই, শুধু ডালপালা।
নিচে ছোট করে লেখা—

"বসন্ত আসেনি, কারণ কেউ বসে থাকেনি।"

এই স্কেচটা এক সন্ধ্যায় এঁকেছিল তানভীর,
যেদিন সে অফিসে খুব দেরি করে ফিরেছিল,
আর মা দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিল,
"তুই খুব দূরে যাচ্ছিস বাবা।"

সে তখন বুঝে উঠতে পারেনি কথাটা।
আজ বুঝতে পারছে—
দূরে যাওয়া মানেই হারিয়ে যাওয়া নয়,
কখনো কখনো কাছের মানুষদের সময় না দেওয়া আরও দূরের।"

—
হঠাৎ খাতার ভাঁজ থেকে পড়ে যায় একটা ছোট্ট পেন্সিল।

ছেঁড়া, ছোট হয়ে যাওয়া, তীক্ষ্ণ মুখ ভাঙা।
তানভীর হাতে নিয়ে চায়,
এটাই সে এক সময় দিয়ে গেছিল নিলাকে—
একসাথে ছবি আঁকার জন্য।
নিলা সেটা ফিরিয়ে দিয়েছিল,
যেদিন চলে যাচ্ছিল।

এখন তানভীর ভাবে—
এই ছোট্ট পেন্সিলটা একটা অসমাপ্ত রেখা,
যা দিয়ে সে নিজের সময়টা শেষ করতে পারেনি।

তানভীর সেই পেন্সিলটা নিয়ে খাতার এক নতুন পৃষ্ঠা খোলে।

আবার আঁকতে শুরু করে—
একটা বেঞ্চ, একটা ফাঁকা কাপ,
একটা জানালা দিয়ে আলো ঢুকছে।
এবং জানালার পাশে বসে আছে এক মানুষ,
যার চোখে শুধু অতীত নয়,
ভবিষ্যতের চুপচাপ পিছুটান।

আজ সে বুঝে গেছে—
স্মৃতি মুছে না,
শুধু সময়ের ধুলোর নিচে চাপা পড়ে যায়।
যদি খুঁজে পাও, তাহলে আবার আঁকা যায়।

—

রাতে ডায়েরিতে তানভীর লিখে—

> “স্মৃতির পেন্সিল দিয়ে জীবন আবার আঁকা যায়,
যদি তোর সাহস থাকে সেই পুরোনো রেখাগুলোতে হাত দিতে।
কারণ কখনো কখনো
ভুলে যাওয়া ছবিগুলোই ভবিষ্যতের মানচিত্র হয়।”

অধ্যায় ৫: ভাঙা দেয়ালের পেছনে

(তানভীর যখন মুখোমুখি হয় নিজের গড়ে তোলা অবহেলার দুর্গভবনের)

বাড়িটার পেছনের দেয়ালটা বহুদিন আগেই ভেঙে পড়েছিল। তানভীর অনেকবার দেখেছে— তবুও সে দেয়ালের ওপারে কখনো যায়নি।
তার কাছে ওই ভাঙা দেয়াল মানে ছিল: "সময়ের খরচ না করা কোনো জায়গা।" অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয়, অপচয়, অথবা বলা ভালো— নিজেকে ব্যস্ত রাখার অজুহাত।
আজ বিকেলে হঠাৎ মনের ভেতর একটা অস্থিরতা জমে উঠল। সারাদিনের ব্যস্ততা শেষে যেন কিছুর ঘাটতি টের পাচ্ছিল সে। এক কাপ চা নিয়েই হাঁটতে হাঁটতে চলে এল বাড়ির পিছনের দিকে। ভাঙা দেয়ালটা দাঁড়িয়ে ছিল আগের মতোই— চুপচাপ, নির্বাক, ধুলোমাখা… কিন্তু আজ যেন দেয়ালটার পেছনে কেউ ডাকছে তাকে। কোনো মুখ নয়, শুধু অনুভূতি।

ভেতরের ডাকে সাড়া দিয়ে তানভীর পা বাড়াল।
দেয়ালটা অতিক্রম করতেই সে ঢুকে পড়ল এক পুরনো জায়গায়, যার প্রতিটি কোণার সঙ্গে তার ছোটবেলা গেঁথে আছে। একটা ছোট্ট নারকেল গাছের চারা ছিল এখানে, যেটা সে নিজ হাতে লাগিয়েছিল ক্লাস ফাইভে পড়ার সময়। এখন সেটা বড় গাছ। তবে মাটির ফাটল আর আগাছার ভিড়ে বোঝাই যায় না কোনটা যত্নের আর কোনটা অবহেলার।
তার চোখ আটকে যায় এক জায়গায়— একটা পুরনো কাঠের বাক্স। ধূলোর স্তরে ঢাকা, পোকায় কাটা কিছু কোণ। কিন্তু এই বাক্সটা একসময় ছিল তার ছোটবেলার গুপ্তধনের ঘর।

তানভীর বাক্সটা খুলে বসে পড়ে ঘাসের উপর।
ভেতরে কী নেই? ছেঁড়া ক্রিকেট বল, একটা ভাঙা রিমোট কার, মায়ের হাতে লেখা একটা ছোট্ট দোয়া, আর একটা ছবি— ছোট্ট তানভীর দাঁড়িয়ে আছে বাবার কাঁধে উঠে। ছবিটার পেছনে লেখা—
"বড় হয়ে মানুষ হবি, কিন্তু ছোট তানভীরটাকে ভুলিস না।"
তানভীরের চোখ ভিজে যায়। সে নিজের অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, যেটা বুকের বহু বছরের বোবা যন্ত্রণার মতো শোনায়।

দেয়াল মানে সবসময় বাধা নয়, অনেক সময় সেটা আড়াল।
তানভীর আজ বুঝতে পারে, এই ভাঙা দেয়ালের পেছনে সে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছিল। তার ভেতরের কষ্ট, শূন্যতা, অপূর্ণতা— সবকিছুর সঙ্গে তার একটা গোপন চুক্তি ছিল, যা সে কোনোদিন সই করেনি, তবুও মেনে নিয়েছিল।
এখানে সময় থেমে ছিল না। শুধু সে নিজেই এখানে ফিরে আসেনি।

চায়ের কাপটা এখন ঠান্ডা।
তানভীর দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে। তাকে মনে হয় সে নিজেই এক ধরনের ভাঙা দেয়াল— যার পেছনে রয়ে গেছে বহু অনুভূতির জমে থাকা ধুলো। স্মৃতি, দুঃখ, অনুশোচনা, বর্জন— সব একসাথে জমা হয়ে গিয়েছে ওই দেয়ালের মতো।
সে ভাবে— যদি দেয়ালটা ভাঙা না হতো, তাহলে কি সে আজ এতটা কাছাকাছি আসত নিজের কাছে?

রাতে ডায়েরিতে সে লিখে—
"ভাঙা দেয়ালের পেছনেও জীবন থাকে। আর সেখানে যে তোর ছোটবেলাটা একা বসে অপেক্ষা করে— তাকে আর অবহেলা করিস না। সময় চলে যায় ঠিকই, কিন্তু দেয়ালের পেছনে পড়ে থাকা সময়গুলোকে একদিন ফেরত চাইতে আসবি।"

অধ্যায় ৬: বাতিঘরের গল্প

রাতের শহরটা দিনের তুলনায় অনেক বেশি সত্য। দিনের ব্যস্ততা, কোলাহল, গাড়ির হর্ন, অফিসের তাড়াহুড়া— সবকিছু যেন একটা মুখোশ। কিন্তু রাত? সে মুখোশ খুলে নেয়, নিঃশব্দে। আর তানভীর সেই রাতে, একটা অচেনা সত্যের দিকে হাঁটতে থাকে।
বাতি নেই, বিদ্যুৎ নেই, শুধু এক কাপ ঠান্ডা চা তার হাতে, আর মনভরা অস্থিরতা। এমনকি এই অন্ধকারেও তানভীর বুঝতে পারে— তার ভেতরে কিছু একটা নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে, যা সে ধরতে পারছে না, বুঝতেও পারছে না, তবুও প্রতিটা নিঃশ্বাসে তার ওজন অনুভব করছে।

বাতিঘরের দিকে হাঁটা
অনেক বছর আগে এই শহরের উপকণ্ঠে একটা পুরনো বাতিঘর ছিল। বাবা একবার তাকে নিয়ে গিয়েছিল সেখানে। বলেছিল— "এই আলোটা কোনো পথ চায় না, শুধু পথ দেখায়। যারা দিক হারায়, তারাই একে খুঁজে পায়।"
তানভীর তখন খুব ছোট, কিছুই বোঝেনি। কিন্তু আজ রাতে হঠাৎ সেই বাতিঘরের কথা মনে পড়ে। মন বলে— সেখানে যেতে হবে।
এক নিঃশ্বাসে সে পাড়ি দেয় বহু বছরের ধুলোমাখা রাস্তা, পেছনে পড়ে থাকে তার আধুনিক জীবন, পড়ে থাকে তার প্রিয় মোবাইল, নোটিফিকেশন, আর সোশ্যাল মিডিয়ার শব্দহীন আসক্তি।

আলো আর এক বৃদ্ধ
সেই পুরনো বাতিঘরের কাছাকাছি গিয়ে হঠাৎ এক ঝাপসা আলো চোখে পড়ে। এক বৃদ্ধ বসে আছেন, এক হাতে ছোট্ট একটা লণ্ঠন, আরেক হাতে একটা পুরনো নোটবুক। তানভীর কিছুটা কৌতূহল নিয়ে কাছে যায়।
“চাচা, আপনি এখানে একা?”
বৃদ্ধ মুখ তুলে তাকান, চোখজোড়া অদ্ভুত কিছুর ইঙ্গিত দেয়। এক ধরনের শান্তি, যেটা না থাকলে কেউ একা এমন অন্ধকারে বসে থাকতে পারে না।
“একা? না বাবা, আমি তো আলোয় আছি।” “এত রাতে আলো জ্বালিয়ে বসে আছেন?” “তুই এসে পড়বি বলেই তো জ্বালিয়েছি।”
তানভীর চুপ হয়ে যায়।

প্রশ্ন আর উত্তর
বৃদ্ধ হঠাৎ তানভীরকে জিজ্ঞেস করেন—
“তুই কি কিছু খুঁজছিস?” “হয়তো… জানি না। সব কিছু আছে, কিন্তু কিছু যেন নেই।”
বৃদ্ধ হেসে বলেন— “যেটা নেই, সেটা তোর ভেতরেই আছে। কিন্তু তুই তাকাস বাইরের দিকে। আসলে সব আলো বাইরে খুঁজে চলিস, ভেতরের অন্ধকারটা চোখে পড়ে না।”
তানভীর মাথা নিচু করে।

ভেতরের আলো জ্বালানো
বৃদ্ধ তখন নিজের নোটবুক থেকে একটা ছোট চিরকুট ছিঁড়ে দেয়। চিরকুটে লেখা—
"যে আলো দেয়, সে পথ খোঁজে না। সে নিজেই পথ হয়ে যায়।"
“তুই এই চিরকুটটা রেখে দে, আর একদিন যখন কাউকে একা দেখবি, তখন তার পাশে দাঁড়াস। কারণ একাকীত্বেরও আলো দরকার হয়।”
তানভীরের মনে পড়ে, সে বহু মানুষকে উপেক্ষা করেছে। যখন তারা চেয়েছিল একটু সময়, একটু মনোযোগ, তখন সে বলেছিল— “ব্যস্ত আছি।” আজ নিজেই সে সেই অন্ধকারে বসে, আর কেউ নেই পাশে।

ফিরে যাওয়া
বাতিঘর থেকে ফেরার সময়, তার মনে হচ্ছিল— এই পথটা বদলে গেছে। আলো কিছুটা টের পাওয়া যাচ্ছে তার চারপাশে। না, বিদ্যুৎ আসেনি। এই আলো বাইরের না— এটা তার ভেতরের।

রাতের ডায়েরি থেকে—
“আজ আমি এক বৃদ্ধের আলোয় নিজেকে খুঁজে পেয়েছি। সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু যদি আমি কারো পথ হই, তাহলে হয়তো সময় একটু ধীরে যাবে… একটু অন্তত আলোর দিকে।”

অধ্যায় ৭: অপেক্ষার ঘর

শহরের এক কোণে, যেখানে সময় যেন একটু ধীর, একটা পুরনো বাড়ি দাঁড়িয়ে আছে— সাদা দেয়াল, জানালার গায়ে মরিচা ধরে ফ্রেম, আর চারপাশে নীরবতা।
তানভীর পৌঁছল এখানে, কারণ সে শুনেছিল— এখানে মানুষ অপেক্ষা করে। শুধু সময়ের জন্য নয়, অন্য কিছুর জন্য। যা সে এখন বুঝতে চায়।

প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল
দুই প্রবীণ মানুষ— একজন প্রবল হাসি আর অন্যজন নিঃসঙ্গতা। বৃদ্ধা মৃদু হাতে খুঁজি খুঁজি এক ছবি, বৃদ্ধ দম্পতির চোখে যেন জীবনের গভীর সব গল্প।
তানভীর ভাবল— এই বাড়ি শুধু বাড়ি নয়, একটা পৃথিবী যেখানে সময় অন্য রকম বয়ে যায়।

বৃদ্ধ দম্পতির গল্প
বৃদ্ধা বললেন— "আমরা সারাজীবন অপেক্ষা করেছি একে অপরের জন্য, কিন্তু সময় সবকিছু নিয়ে গেছে। আমার স্বামী ছিল সমুদ্রের মতো, আমার ছিল এক তরঙ্গ— আমরা কখনো একসঙ্গে মিলিনি, তবু প্রতিদিন অপেক্ষা করেছি।"
তানভীর বুঝতে পারল— এই অপেক্ষা ছিল ভালোবাসার গভীর একটি রূপ, যা হয়তো সে কখনো চিনত না।

অপেক্ষার অর্থ
বৃদ্ধ বললেন, "অপেক্ষা মানে শুধু সময়ের হিসাব নয়, এটা হলো হৃদয়ের একটুকরো আশা। যে আশা পুষে রাখতে পারি শুধু ভালোবাসার জোরে।"
তানভীর চোখে অজানা কোনো অনুভূতির ঝিলিক দেখা গেল। সে ভাবল— জীবন জুড়ে কত অপেক্ষা আছে তার, কত স্বপ্ন, কত মানুষ যে সে ভুলে গিয়েছে।

তানভীরের ভেতরের পরিবর্তন
সেদিন রাতেই, তানভীর বুঝল— সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের জীবনের সেরা মুহূর্তগুলো অপেক্ষার মধ্যেই থাকে। যেখানে এক ক্ষণিকের জন্য, কেউ কারো জন্য থামে, আশা করে, প্রার্থনা করে, ভালোবাসে।

ডায়েরির পাতা থেকে
"আজ আমি শিখেছি— অপেক্ষার ঘর শুধু শূন্যতার জায়গা নয়, এটা ভালোবাসার এক গভীর অধ্যায়। সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু অপেক্ষা থেমে থাকে হৃদয়ে।"

অধ্যায় ৮: হারানো স্বপ্নের খোঁজে

রাতের চেয়ে গভীর কিছু আছে মানুষের জীবনে — হারানো স্বপ্নের সেই নিঃসঙ্গতা, যা কখনো হয়তো বলে দেয়নি, তবে বুকে ঝড় তুলে দেয়।
তানভীর একা বসে ছিল তার ছোট্ট ঘরে, চায়ের কাপ হাতে, জানালার বাইরে ঝিরঝির বৃষ্টি, আর ভেতরে এক মৃদু বিষাদের ছায়া।

একসময় স্বপ্ন ছিল তার জীবনসঙ্গী—
শিশুকালে সে স্বপ্ন দেখত একদিন অজানাকে জয়ের, নিজের সৃষ্টির আলোয় পৃথিবী আলোকিত করার। কিন্তু সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে হারিয়েছিল সেই স্বপ্ন, কাজের গেরস্থালায় মিশে গিয়েছিল জীবনের প্রতিটি জোড়।

একদিন হঠাৎ—
তানভীর পেয়েছিল এক পুরনো আলমারি, তার ভেতর থেকে বের করে আনা ছিল এক পুঁথি, যেখানে তার ছোটবেলার স্বপ্নগুলো লেখা ছিল অক্ষরে অক্ষরে। সে পুঁথিটা খুলে পড়ল, প্রতিটি পাতা যেন তার হারানো বয়সের ডাক।

স্বপ্নগুলো আবার জেগে উঠল—
তানভীর বুঝল, এই স্বপ্নগুলো না থাকলে সে আজকের মানুষ হতো না। এই স্বপ্নগুলোই তার ভেতরে লুকানো আলো, যা তাকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে পারে।

একসাথে তার স্মৃতির যাত্রা—
তার চোখে পানি, হৃদয়ে এক অজানা উন্মাদনা, সে ভাবল— এই হারানো স্বপ্নগুলো ফিরে পেতে হয়, আর তাদের দিয়ে নতুন কিছু গড়ে তুলতে হয়।

ডায়েরির পাতায় লেখা—
“সময় চলে যাচ্ছে, হারানো স্বপ্নের সুর তো এখনও বাজে, শুধু শোনা দরকার, আর বিশ্বাস করার সাহস।”

অধ্যায় ৯: ভাঙা আয়নায় নিজের ছবি

তানভীরের হাত নড়ল আলমারির ধুলো মুছতে মুছতে,
হঠাৎ সে দেখল একটি ছোট, ভাঙা আয়না।
ছিটকে পড়া চিরুনি, অর্ধেক ভাঙা রূপ,
তবুও আয়নাটা যেন তার চোখে কথা বলতে চাইছে।

আয়নাটা তার জীবনের মতো

ভাঙা আয়নায় তার ছবি ধুলো আর আঁচড়ে ঢাকা,
আয়না ভাঙা হলেও প্রতিফলন থেমে থাকে না,
কিন্তু সে প্রতিফলন নিজেই ভেঙে-চুরে যেন হারিয়ে গেছে।
তানভীর বুঝল, জীবনও ঠিক এমন—
যখন ভেঙে যায়, তখনও নিজেকে খুঁজে পেতে হয়।

স্মৃতির টুকরোগুলো

প্রতিদিনের ব্যস্ততায় সে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল,
জীবনের ভাঙা টুকরো দিয়ে ছবি আঁকতে গিয়েছিল।
অন্যের জন্য তৈরি করেছিল অভিনয়,
নিজের আসল চেহারা ভুলে গিয়েছিল।
কখনও সে নিজেকে দেখে না —
সেই ভাঙা আয়নায় নিজের ভগ্ন প্রতিচ্ছবি।

এক সন্ধ্যায়

সে আয়নাটা হাতেই নিয়ে এক দীর্ঘশ্বাস ফেলল,
ভেবেছিল, কি করে আবার পুরো আয়না করা যায়?
কিন্তু হঠাৎ বুঝল— পুরো আয়না দরকার নেই,
ভাঙা টুকরোই আসল গল্প বলে।

ভাঙা আয়নার গল্প

ভাঙা আয়না ঠিক মতো দেখায় না,
তবুও তার প্রতিটি টুকরোই আলাদা আলাদা গল্প বোঝায়।
আয়নার টুকরোগুলো মিলিয়ে নিজের ভেতরের গল্পও মিলিয়ে দেখা যায়।

নিজের সাথে চুক্তি

তানভীর ঠিক করল—
ভাঙা টুকরো গুলোকে সে গৃহীত করবে,
নিজের পুরনো ভুল আর ব্যর্থতাকে হাতড়াবে,
আর নিজেকে ঠিক তেমনি ভালোবাসবে,
যেমন এই ভাঙা আয়না নিজের ভাঙ্গা চেহারাকে।

ডায়েরি থেকে—

> “সময় চলে যাচ্ছে,
আমি ভাঙছি, কিন্তু গড়ছি নিজেকে নতুন করে।
প্রতিটি ভাঙা টুকরোই আমার জীবনের গল্প,

আর আমি সেই গল্পের প্রহরী।”

অধ্যায় ১০: নিঃসঙ্গতার সুর

তানভীরের জীবন আবার একবার থেমে গেল।
কিন্তু এবার থামা নয়,
এক ধরনের নিঃসঙ্গতার গভীরে ডুব দেওয়ার গল্প।

রাতের নীরবতা তার একমাত্র সঙ্গী,
দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়ে বাজে নিঃসঙ্গতার সুর।
কখনো শোনা যায় নিজেরই হৃদয়ের কথা,
যা আগে বুঝতে পারেনি সে।

নিঃসঙ্গতার অন্ধকারে আলো খোঁজা

তানভীর দেখল, নিঃসঙ্গতা শুধু একা থাকার নাম নয়,
এটা হলো নিজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার এক পবিত্র সময়।
যেখানে কাঁদার মতো নেই,
কেবল অনুভবের গভীরতা আছে।

স্মৃতির ভেলায় ভাসা

তার মনে পড়ল পুরনো দিনগুলো,
যেখানে হাসি ছিল মধুর,
তবু ভিতরটা ছিল ফাঁকা।
নিঃসঙ্গতা তাকে শিখিয়ে দিল,
এই ফাঁকটাই আসল জীবনের অংশ।

নিঃসঙ্গতার কবিতা

তানভীর নিজেকে বুঝল,
নিজের কাছে নিজের যত্ন নেওয়াই সবচেয়ে বড় কাজ।
একটু বিষাদ আর একটু আশা নিয়ে,
নতুন জীবন গড়ে তোলার সোপান শুরু হল।

ডায়েরির পাতায়

> “সময় চলে যাচ্ছে,
নিঃসঙ্গতা আমার সাথী,

তার ছায়ায় আমি নিজের অন্ধকার আলো দেখতে শিখেছি।”

অধ্যায় ১১: নতুন সূর্যের অপেক্ষায়

সকালের প্রথম আলো যখন ফুঁটতে শুরু করে,
তানভীরের মনে হল যেন নতুন কিছু শুরু হতে যাচ্ছে।
নির্জন রাতের পর সূর্যের কোমল হাসি তার বুকের অবসাদ মুছে দেয়।

জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা

তানভীর ভাবল—
“সময় চলে যাচ্ছে, আর আমি কি শুধু অতীতের ছায়ায় বসে থাকব?”
সে বুঝল, জীবনের সেরা সময় এখনো আসেনি,
এই মুহূর্তে নিজের হাতে নিয়েই সে নতুন সূর্য গড়বে।

নিজের প্রতি নতুন দায়িত্ববোধ

অতীতের ক্ষত সারিয়ে নতুন স্বপ্ন গড়ার ইচ্ছা নিয়ে,
তানভীর ঠিক করল নিজের প্রতি যত্ন নিবে,
নিজের স্বপ্ন পূরণে এক নতুন যাত্রা শুরু করবে,
যেখানে হতাশা নয়, থাকবে একটুকরো আশা।

ছোট ছোট মুহূর্তের আনন্দ

সে শিখল ছোট ছোট মুহূর্তগুলোতেই খুঁজে নিতে সুখ,
একটা হাঁসির খোঁজ, একটি গাছের ছায়া,
এক কাপ চায়ের গরম ভাব, আর প্রিয় কারো কথায় আশা।

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু আমি এখনো বাঁচি,
নতুন সূর্যের অপেক্ষায়,
নতুন জীবনের স্বপ্নে।”

অধ্যায় ১২: স্মৃতির পাখির গান

তানভীরের মনের একান্ত কোণে
একটা পুরনো দিনের স্মৃতি ঘুরপাক খাচ্ছে।
একটা পাখির গান শুনতে পায় সে,
যা তাকে ফিরিয়ে নেয় অতীতের এক অজানা জগতে।

স্মৃতির মায়াজালে বন্দী

সেই স্মৃতির পাখি,
যার কণ্ঠে ছিল জীবনের প্রথম ভালোবাসার সুর।
কিন্তু সেই সুর যেন হারিয়ে গেছে সময়ের কোলে,
বছর গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ম্লান হয়ে এসেছে।

ফিরে পেতে চাওয়া হারানো গান

তানভীর চায় সেই পাখির গান ফিরে পেতে,
যাতে আবার জীবনের হারানো আনন্দ বাজে।
তবে জানে, স্মৃতির পাখিকে ধরে রাখা কঠিন,
তবু চেষ্টা করতে চায় সে।

একান্তে কথা

সে বসে একা, কাগজে কলম নিয়ে,
লিখতে শুরু করে তার স্মৃতির পাখির গান।
কখনো মৃদু, কখনো ঝংকারের মতো,
তাতে মিশে আছে তার জীবনের ভালবাসা আর বেদনা।

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু স্মৃতির পাখির গান
এখনও হৃদয়ে বেজে ওঠে,
জীবনের সব হারানোর মাঝেও।”

অধ্যায় ১৩: ধৈর্যের আলো

তানভীরের জীবনে যখন সব কিছু ধুয়ে মুছে ফেলা মনে হচ্ছিল,
তখন সে বুঝল—সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু ধৈর্য হারানো যায় না।
ধৈর্য হলো মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি,
যা তাকে অন্ধকারে আলোর পথ দেখায়।

স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটা

জীবনের নদী অনেক সময় প্রবল স্রোতের মতো,
যে স্রোতে হারিয়ে যেতে চায় মানুষ।
তানভীর জানল, হার মানার চেয়ে ভালো
স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের পথ হাঁটা।

বিশ্বাস ও আস্থা

সে নিজেকে বলল,
“আল্লাহর রহমত সবসময় রয়েছে,
তুমি যদি ধৈর্য ধরো,
সেই রহমত তোমাকে ছুঁয়ে যাবে।”

অন্তরের আলো

তানভীর দেখল ধৈর্য তার হৃদয়ে আলোর মতো জ্বলছে,
যা অন্ধকার রাতেও তাকে পথ দেখায়,
একাকীত্বের মাঝে সাহস যোগায়,
আর জীবনের বাঁকগুলো অতিক্রম করতে সাহায্য করে।

ডায়েরির পাতায়

> “সময় চলে যাচ্ছে,
ধৈর্যের আলো আমার পথের প্রদীপ,
আল্লাহর করুণা আমার সঙ্গী।”

অধ্যায় ১৪: নতুন সকাল

সকাল হলেই যেন জীবন নতুন রূপে বাঁচে। তানভীর জানত, আজকের সূর্য তার জন্য শুধু আলো নয়, একটা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দেবে। রাতের অন্ধকার যত গভীরই হোক না কেন, প্রতিটি ভোরই একটা নতুন সূচনা।

জীবনের প্রথম আলো
সকালের ঠান্ডা বাতাসে একটা সজীবতা অনুভব করল সে। প্রতিটি শ্বাসেই যেন নতুন শক্তি ঢুকছে, মানুষের জীবনে অনেকবার হারানো হয়, তবে নতুন সূর্যের আলোর মতই আসে ফিরে নতুন আশা।

হৃদয়ের নতুন সুর
তার মনটি ছিল শান্ত, আবারও স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। স্বপ্ন যেগুলো সে অনেক দিন ধরে ভুলে গিয়েছিল, এখন সেগুলো আবার ধীরে ধীরে প্রাণ পেতে শুরু করল, আলোর মতো ঝলমল করতে লাগল তার ভেতর।

জীবন বদলের প্রথম ধাপ
তানভীর বুঝল, জীবনের যাত্রা থেমে থাকে না। যে পথ ধরে চলতে হয়, তা একদম নতুন ধাপ নেয়। প্রতিদিন একটু একটু করে নিজের কাছে ফেরার সুযোগ এনে দেয়।

ডায়েরির পাতা থেকে
“আজকের সকাল আমার জন্য নতুন আশার বাতি। এই আলোয় আমি আমার হারানো স্বপ্নগুলো খুঁজে পেতে চাই, সময় চলে যাচ্ছে, কিন্তু আমি এখনো বাঁচছি, নতুন জীবনের পথ খুঁজছি।”

অধ্যায় ১৫: ছোট খুশির খোঁজে

তানভীর আজ বুঝতে শুরু করল,
জীবন বড় সুখের নয়, ছোট ছোট মুহূর্তের সমষ্টি।
যে ছোট খুশিগুলো ভুলে যাওয়া যায় না,
তাই তাকে গুছিয়ে ধরে রাখতে হবে।

এক কাপ চায়ের গরম ভাব
বাইরের ঠান্ডা হাওয়ায় এক কাপ গরম চা,
জীবনের সেই ক্ষুদ্র আনন্দগুলো মনে করিয়ে দেয়,
যে সুখের জন্য বড় কোনো উপলক্ষ্যের দরকার নেই।
একটা হাসি, ছোট্ট কথাবার্তা,
এইসবই জীবনের মধুরতা।

স্মৃতির পাতায় লেখা হাসি
তানভীর নিজেকে সময় দিলো স্মৃতির সঙ্গে কথা বলার।
সেই পুরনো দিনের হাসি, বন্ধুর ভালোবাসা,
সবকিছুই তার হৃদয়ে ফিরে এলো,
যা তার একাকীত্বের কাঁটা কমিয়ে দিল।

জীবনের ছোট ভালোবাসা
সে শিখল, বড় স্বপ্নের পাশাপাশি,
ছোট ভালোবাসা আর কৃতজ্ঞতা রাখতে হবে হৃদয়ে।
কারো পাশে থাকা, কারো কথা শোনা,
ছোট ছোট ভালো কাজগুলোই জীবনের আসল অর্জন।

ডায়েরির পাতা থেকে
“সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু আমি শিখেছি,
ছোট ছোট সুখের মাঝে লুকিয়ে আছে জীবনের বড় কথা।”

অধ্যায় ১৬: আত্মবিশ্বাসের গান

তানভীরের হৃদয়ে গুঞ্জন শুরু হল—
একটা নতুন সুর, যা তাকে বলল,
“তুমি পারবে, তুমি এগিয়ে যাবে।”

ভাঙা স্বপ্নের মাঝে আশা

বছর গুলো ভেঙে দিয়েছিল তার স্বপ্নগুলোকে,
তবুও হৃদয়ের এক কোনায় জমে আছে
আত্মবিশ্বাসের সেই মধুর সুর,
যা তাকে দিচ্ছে সাহস নতুন কিছু শুরু করার।

নিজের প্রতি বিশ্বাস

তানভীর বুঝল, জীবনের প্রতিটি ব্যর্থতা
তার শক্তি বাড়িয়েছে, তাকে প্রস্তুত করেছে।
এখন সময় এসেছে নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখার,
নিজের ক্ষমতাকে চিনে নেওয়ার।

সাহসের প্রথম ধাপ

সে সিদ্ধান্ত নিল, ছোট ছোট লক্ষ্যগুলো ঠিক করে চলবে,
যা তাকে ধীরে ধীরে বড় স্বপ্নের দিকে নিয়ে যাবে।
প্রতিদিন এক ধাপ এগোনোর মধ্যে নিহিত আছে বিজয়।

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু আমার হৃদয়ে বাজছে আত্মবিশ্বাসের গান,
যা আমাকে বলছে—
তুমিই নিজের ভাগ্য পরিবর্তনের লেখক।”

অধ্যায় ১৭: বন্ধুত্বের ছায়ায়

জীবনের অন্ধকারে যখন আশার আলো কমে যায়,
তখন আসে বন্ধুত্বের মায়া—
যা হৃদয়কে স্পর্শ করে, নতুন শক্তি জোগায়।

একান্ত মুহূর্তে সঙ্গী

তানভীর অনুভব করল, সত্যিকারের বন্ধুদের দরকার,
যারা তার ভালো-মন্দ সব সময় পাশে থাকবে।
যাদের সঙ্গে হাসি, কষ্ট, স্বপ্ন ভাগাভাগি করা যায়।

বন্ধুত্বের অমূল্য উপহার

বন্ধুত্ব হলো জীবনের এক অমূল্য সম্পদ,
যা দুঃখের মেঘ ছটিয়ে দিয়ে সূর্যের আলো এনে দেয়।
তানভীর খুঁজে পেল তার জীবনে নতুন বন্ধুত্বের আলো,
যা তাকে আবার চলার পথ দেখালো।

সহমর্মিতার শক্তি

বন্ধুরা তার ভেতরের বিষাদ বুঝতে পারল,
তাদের ভালোবাসা তাকে পুনর্জীবিত করল।
এভাবেই ধীরে ধীরে তানভীরের মন ভালো হতে লাগল।

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু বন্ধুত্বের ছায়ায় আমি নতুন করে বাঁচছি,
ভালোবাসা ও সহমর্মিতায় আমার পথ আলোকিত হচ্ছে।”

অধ্যায় ১৮: আশার দিশারি

তানভীরের মনে জাগল এক অম্লান আশা,
যা তাকে জীবনের সব কষ্ট ও হতাশার মুখোমুখি দাঁড়াতে সাহস দিল।

আঁধারের মাঝে আলো

কখনো কখনো জীবন এমন অন্ধকারে ডুবিয়ে দেয়,
যেখানে আশা হারিয়ে ফেলা সহজ হয়ে যায়।
তবে তানভীর শিখল,
আশাই সেই আলো যা আবার পথ দেখায়।

অন্তরে আশার বীজ বোনা

সে জানল, জীবনের বুকে যদি আশার বীজ রোপণ করা যায়,
তাহলে যেকোনো ঝড়ও তাকে ছুঁতে পারবে না।
তার চিন্তা আর মনোবল একাকার হয়ে গেলো এই বিশ্বাসে।

কঠিন সময়ের সাহারা

যখন সব দরজা বন্ধ মনে হল,
তখন আশার দীপ জ্বেলে সে নিজেকে শান্ত করল।
তার মনে একটি কথা বারবার ফিরে এল—
“তুমি পারবে, ধৈর্য ধরো।”

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু আমি জানি, আশার দিশারি আমার সঙ্গে আছে,
যা আমাকে অন্ধকারেও আলোর পথ দেখায়।”

অধ্যায় ১৯: জীবনের বাঁকে বাঁকে

জীবনের পথে বাঁক কতই না আসে,
যেখানে সবকিছু স্থির থাকে না,
তানভীর শিখল এই বাঁকগুলোই তাকে নতুন করে গড়ে তোলে।

অজানার মুখোমুখি

বাঁকগুলো ছিল অজানার মুখোমুখি,
যেখানে হেঁটে চলা মানে ছিল নিজের ভয়ের মোকাবিলা করা।
তবে সে ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলল।

শিক্ষা ও শক্তি

প্রতিটি বাঁকে নতুন শিক্ষা, নতুন শক্তি নিয়ে আসে।
তানভীর বুঝল, জীবনের লড়াইগুলোই তাকে
আরও দৃঢ় ও সাহসী করে গড়ে তুলেছে।

নিজের পথে দৃঢ়তা

সে শপথ করল—যতই বাঁক আসুক, সে থামবে না,
কারণ প্রতিটি বাঁকই নতুন স্বপ্নের সূচনা।
এভাবেই তার মনোবল আরও দৃঢ় হলো।

ডায়েরির পাতা থেকে

> “সময় চলে যাচ্ছে,
কিন্তু আমি প্রতিটি বাঁককে গ্রহণ করছি,
কারণ এগুলো আমাকে মজবুত করে।”

অধ্যায় ২০: সময় চলে যাচ্ছে — সমাপ্তি

সময়...
একটি অদৃশ্য নদী, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে বয়ে চলছে।
তানভীরের জীবনও সেই নদীর মতো —
ঝড়-ঝঞ্ঝার মাঝে গড়িয়ে চলা,
হাতে ধরা নতুন আশা আর হারানো স্বপ্নের ছায়া নিয়ে।
ক্ষণস্থায়ীর মাঝে স্থায়ীত্বের সন্ধান

তার হৃদয়ে লুকিয়ে ছিল গভীর যন্ত্রণাও,
তবুও সে শিখেছে—
জীবন ক্ষণস্থায়ী,
তবুও ভালোবাসা, বিশ্বাস আর স্বপ্ন স্থায়ী।
প্রতিটি মুহূর্তকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে চলতে হয়,
কারণ সময় কখনো থামে না।

জীবনের শিক্ষা

তানভীরের গল্প আমাদের শেখায়—
ভুল থেকে শেখা, হাল না ছেড়ে লড়াই করা,
বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার শক্তি বিশ্বাস করা,
আর সব শেষে, নিজেকে ভালোবাসা।
যে পথ তাকে শক্তি দিয়েছে,
সে পথই আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তোলে।

নতুন যাত্রার আহ্বান

সময়ের স্রোতে হারিয়ে যাওয়া নয়—
তার পরিবর্তে নিজের স্রোত নিজেই তৈরি করা।
এটাই জীবনের মর্ম।
তানভীর আজ নতুন করে বুঝতে পেরেছে,
যে সময় চলতে থাকবে, আর সে চলবে তার সঙ্গেই।

লেখকের কথা

আমি, শাকিল আহমেদ সাগর,
তানভীরের গল্পের এই যাত্রায় আপনাদের সঙ্গ পেয়ে খুশি।
সময়ের সাথে আমাদের জীবনও বদলায়,
আর তাই প্রতিটি গল্পের মধ্যে লুকিয়ে থাকে নতুন উপলব্ধি, নতুন আশা।

আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও গল্প,
যেগুলো আপনাকে আরও গভীর অনুভূতি ও ভাবনার কাছে নিয়ে যাবে।

পরবর্তী বইগুলোতে আমন্ত্রিত—
সেখানে সময়ের চলমান ধারা,
আমাদের জীবনের আরও মধুর,
আরও গভীর দিক উন্মোচিত হবে।

তাই অপেক্ষা করুন,
আর হাত বাড়িয়ে নিন জীবনের সেই নতুন গল্পগুলোকে।

শেষ

“সময় চলে যাচ্ছে” — কিন্তু গল্পের যাত্রা এখানেই শেষ নয়।
এসো, পরবর্তী যাত্রায় দেখা হবে।